লবণাক্ত করে দিয়েছে, যদিও অল্প কয়েকটি জায়গায় মিষ্টি জলের উৎস পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে প্রধানত সুন্দরী, গর্জন, গরাণ, বাইন, ক্যাওড়া, হেতাল, তবলা প্রভৃতি গাছ দেখা যায়, এগুলি খুব উঁচু নয়। এইসমস্ত গাছ পশ্চিমবঙ্গের আর কোন স্থানে চোখে পড়ে না। নৌকা থেকে স্থলভূমিতে নেমে আসা খুবই কঠিন। ভাঁটার সময় স্থলভূমি এঁটেল মাটির কাদায় কর্দমাক্ত থাকে, যাতে পায়ের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। মাটির উপর জেগে থাকে গাছের শ্বাসমূল—শক্ত শূলের ন্যায় দেড়-দু-ফুট লম্বা এই মূলের জন্য স্থলভূমিতে সহজে চলাচল করাই দুষ্কর।

সুন্দরবনের মিষ্টি জলের উৎসে তিনদিন কাটানোর সুযোগ আমি একবার পেয়েছিলাম। বেশ কয়েকবছর আগের শীতকালের সকালে ক্যানিং স্টেশন থেকে ভ্যানরিক্সায় জেটিঘাট, জেটিঘাট থেকে লঞ্চে উঠলাম। অনেকগুলো পুরোন লঞ্চের মধ্যে একটাই সুন্দর রঙ-করা, ঝক্‌ঝকে লঞ্চ—এর একতলার খোলে দুটি কেবিন এবং প্রতিটি কেবিন দুইজনের থাকার ব্যবস্থা। পাশে সুন্দর খাবার ঘর এবং বাথরুম ছিল। যা ইঞ্জিনের অংশ থেকে আলাদা। উপরের অংশ সারেঙ্গের ঘরের সামনে টানটান করে রঙিন, সুন্দর শামিয়ানার ব্যবস্থা ছিল, ডেকে চেয়ার এবং অন্যান্য বসবার ব্যবস্থা মিঠে রোদ পিঠে নিয়ে, উত্তরে হাওয়ায় মাতলার বুক চিরে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চললাম। নদীর বুকে হাঁসের ঝাঁক ও পরিযায়ী পাখির দেখলাম। যাত্রাপথের শুরুতে বিস্তীর্ণ দুই পাড়ে সবুজের অংশ খুবই কম, লবণাক্ত জলের কারণে চাষাবাদ এখানে খুব বেশী হয় না। বাসন্তী, গোসাবা পেরিয়ে আমরা সরকারী কৃষি খামারে উপস্থিত হলাম— এটি সুন্দরবনের প্রবেশদ্বারে অবস্থিত। এখানে প্রথাগত জেটি নেই। জোয়ার প্রায় শেষ হয়ে আসছিল, তাই লঞ্চ থেকে লম্বা কাঠ পেতে দেওয়া হয়েছিল। অদ্ভুত ধরনের কাঠ— পা ফেলার জন্য লম্বা কাঠটির উপর ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে পৃথকীকরণ করা এবং ভার রাখার জন্য পাশে লম্বা বাঁশ রাখা ছিল। নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা, হাতে জুতো নিয়ে, অল্প খানিকটা কাদা মাড়িয়ে আমরা বাঁধের উপর উঠে এলাম। সেই প্রথম আমি সুন্দরবনের মাটির স্পর্শ, গন্ধ অনুভব করলাম। এখান থেকে খামারের অতিথিশালার দূরত্ব এক-কিলোমিটারের উপর, শীতের রোদ মাথায় নিয়ে আমরা পদব্রজে কৃষিখামারের অতিথিশালায় উপস্থিত হলাম। একতলায় দুটি ছিমছাম ঘর—বিদ্যুতের সংযোগ তখনো আসেনি, সভ্য শহর থেকে অনেক দূরে একটা সবুজ দ্বীপের মধ্যে এই কৃষিখামার। দুপুরের আহারের আয়োজন পরিবেশ এবং পরিস্থিতির তুলনায় অবশ্যই অধিক পরিমানে আকর্ষণীয় ছিল—ভাত, শুক্তো, মুগডাল, আলুভাজা, রুই এবং ভেটকি সহযোগে, ডাবের জলের আস্বাদনে আমাদের দ্বিপ্রাহরিক আহার সমাপ্ত হল। মাছগুলি এখানকার নিজস্ব পুকুরে চাষ করাএবং ডাব এখানকারই বাগানের ফসল।

দুপুরে বিশ্রাম নেওয়ার পরে বিকালে আমরা বেরোলাম খামার ঘুরে দেখার জন্য। পাশে একটি নয়নজুলি চোখে পড়ল যার গভীরতা চার-পাঁচ ফুট। লম্বা প্রায় ৫০০-৬০০ মিটার, চওড়া ১২ ফিটের বেশী। এটি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর মুখে একটা লকগেট বসানো। প্রয়োজনে নদীর লবণাক্ত জলকে ভিতরে ঢোকানো হয়, সেইসঙ্গে আসে বাগদা চিঙড়ি, ভেটকি, গুরজালি, পার্শে মাছের পোনা। মাছ চাষের জন্য পোলট্রির অবশিষ্ট অংশ নয়নজুলির জলে ফেলা হয়, যা পোনার খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিকালে মাছ ধরার জালে যে পরিমান ভেটকি এবং গলদা বাগদা চিংড়ি উঠে এল, তা সত্যি প্রশংসনীয়। এক-একটি ভেটকি মাছের ওজন প্রায় দুই কেজির উপর যা পরের দিন সকালে গোসাবা বাজারে বিক্রি হবে। কাজেই, রাতের খাওয়াটা যে ভালোই উপভোগ্য হয়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সুন্দরবনের অপরিমেয় মাছের ঝাঁক বাঙালীর রসনা তৃপ্ত করার জন্য আদর্শ। এখানকার ছোট ছোট খালে জাল ফেললে মাছের ভারে জাল টেনে তোলা কষ্টকর হয়, উপযুক্ত রপ্তানির ব্যবস্থা থাকলে অর্থনৈতিক ভাবে এই অঞ্চল লাভবান হতে পারতো। উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে হাতে বোনা জালে অল্প সংখ্যক মাছ ধরেই এখানকার মানুষদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বেশ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সুন্দরবনের এক-দুই মন ওজনের কইভোল মাছের নাম শোনা যেত।

আবার ফিরে আসি খামারের গল্পে। এখানে চার-পাঁচটি পুকুর কাটা রয়েছে যেখানে বর্ষার প্রাকৃতিক জল ধরা হয়। এই জল থেকে সারা বছরের পানীয় এবং চাষের কাজ চালান হয়। এই অঞ্চলের লবণাক্ততার কারণে কোন গভীর কিংবা অগভীর নলকূপের জলকে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করাযায় না। একটা বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ না করলে এই অংশের লেখন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিকালে পুকুর পরিদর্শনের সময় কৃষিখামারের সহায়ক এক ব্যক্তি আমাদের কাছে

এসে জানতে চাইল আমরা মাছ ধরতে চাই কি না। আমরা আমাদের অক্ষমতার কথা জানালে তিনি নিজেই গোটা কয়েক হাতছিপ, কেঁচো এবং ময়দা সহযোগে মাছ ধরতে আরম্ভ করল। আমরাও উৎসাহী হয়ে উঠলাম, অনভিজ্ঞ হাতে হাতছিপ নিয়ে জলে ফেলতেই প্রত্যেকবারে এক একটি বাছ উঠে আসতে লাগল, আনন্দে হইচই করে উঠলাম। রাতের খাবারের মেনুতে অবশ্যই আমাদর নিজের হাতে ধরা কিছু 'উপকরণ'ও যুক্ত হয়েছিল।

সুন্দরবনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সকাল শুরু হয় মীন ধরার মাধ্যমে। নাইলনের মশারির ন্যায় জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শুধুমাত্র বাগদা চিংড়ির একটি বা দুটি মীনকে বেছে নিয়ে বাকি মীনগুলিকে ডাঙার ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এই 'মীনের অভিশাপ' বহুদিনের। শুধুমাত্র অধিক পরিমানে আর্থিক লাভের জন্য গলদা বা বাগদা মীনগুলিকে পৃথকীকৃত করা হয়, বাকি মীনগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বিপুল পরিমান মাছের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। সচেতনতা বাড়াতে না পারলে ভবিষ্যতে পরিমান ভয়ঙ্কর হতে পারে। মাতলা নদীর যেখানে অন্যান্য নদীর সঙ্গে মিশেছে, সেই অঞ্চলে নদীর দুইকূল দেখা যায় না। এরপর থেকেই শুরু হয়েছে সজনেখালি অভয়ারণ্যে। বনাঞ্চলের সুন্দরী, গর্জন, গরান, হেতাল প্রভৃতিই প্রধান, যা কখনোই খুব বড় হয় না। কিন্তু বসত অঞ্চলের মধ্যে আম, জাম, বট প্রভৃতি প্রধান। পাখিরালয়, সজনেখালির ঠিক বিপরীতেই অবস্থিত, সেখানে এই প্রভেদটা সহজেই চোখে পড়ে। সজনেখালির জেটিতে আমাদের লঞ্চ এসে ভিড়ল। সুন্দরবন ভ্রমণার্থীদের মুখে শোনা যায় যে তারা এখানে জন্তু-জানোয়ার খুব বেশী দেখা যায় না, এর কারণ হয়তো লঞ্চের শব্দ এবং জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশাধিকার না পাওয়ার কারণে। আমরা ওয়াচ টাওয়ারে উঠে পড়লাম, একদল হরিণ চোখে পড়ল। এছাড়া এখানে ঘুরে দেখার মত একটি কুমীর প্রকল্প এবং নানা সংগ্রহশালা রয়েছে। এখান থেকে আমরা খানিকটা প্রাকৃতিক মধু কিনলাম। পরের গন্তব্য সুধন্যখালি, এখানে জেটি থেকে লম্বা তার দিয়ে ঘেরা খাঁচার মত অঞ্চল যা ওয়াচ টাওয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ফাঁকে দরজা থাকলেও, তা সযত্নে বন্ধ, নতুবা নাকি বাঘ ঢুকে বসে থাকবে। ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা? শহরে আমরা চিড়িয়াখানায় খাঁচার মধ্যে পশুপাখি দেখি, এখানে অরণ্যের মুক্ত পরিবেশে স্বাভাবিক নিয়মে তারা রয়েছে, আর আমরা খাঁচার মধ্যে থেকে তাদেরকে দেখছি। সুধণ্যখালির পাশ দিয়ে একটা সরু খাল জঙ্গলের ভিতরে চলে গেছে। এই খাঁড়ি পথে আমরা বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেলাম। সুন্দরবনে মোটরবোট চালান বেশ মজার, সারেঙ স্টিয়ারিং ধরে উপরে বসে থাকে, কিন্তু ইঞ্জিনটা থাকে নীচে। উপর থেকে দড়িবাঁধা ঘন্টা বাজিয়ে সিগন্যাল দিলে ইঞ্জিন চালু এবং বন্ধ হয়, একে অপরের দেখতে পর্যন্ত পায় না। খাঁড়ির দুধারে ঘন অরণ্য, যেখানে এসে পৌছলাম, তার দুধারে ক্যাওড়া গাছ। বেশ কিছু গাছের ডালে কাপড়ের টুকরো বাঁধা। সারেঙ্গ জানাল এগুলিকে ঝামটি বলে, তার মানে এখানে বাঘে মানুষ নিয়েছে, তাই এই সতর্কবার্তা। কয়েকটি কাপড় বেশ নতুন। এই প্রথম শরীরে শিহরণ খেলে গেল। একটা মিষ্টি গন্ধ অনেকক্ষণ ভেসে আসছিল। কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা নৌকা পাড়ে লাগিয়ে পাড়ে নামার চেষ্টা করছে—হাতে লাঠি, বল্লম, মাথায় পিছনে অদ্ভুত ধরনের মুখোশ। এর কারণ হিসাবে সারেঙ আমাদের জানালো বাঘ সাধারণ পিধন দিক থেকে আক্রমণ করে। পিছনের দিকে মুখোশ থাকার বাখের নাকি বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। সুন্দরবনের মধু এবং মোম প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি। গরান ফুলের মধুই এখানে অধিক প্রসিদ্ধ। হাতে লাঠি, মশাল, বর্শা নিয়ে অসমসাহসী এই মানুষগুলো পেটের দায়ে প্রায় প্রতিদিনই এক অসম, অনিশ্চিত যুদ্ধের জন্য যাত্রা করে। সরকার থেকে বাঘ তাড়ানোর জন্য মউলেদের 'আছড়ি পট্‌কা' দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় এর আওয়াজে ভয়ে পালানোর পরিবর্তে, মাঘ আকৃষ্ট হয় এবং মউলেদের অবস্থান জেনে যায়। মশালের ধোঁয়ায় মৌমাছি তাড়িয়ে গাছ থেকে মৌচাক ভাঙা হয় এবং মৌচাক থেকে নিংড়ে মধু নিষ্কাশন করা হয়। এদের হাতে যে লাঠি থাকে, তা সাধারণ নয়। অনেক মোটা এবং অনেক বেশী শক্ত, মজবুত—'হেতালের নড়ি' নামে পরিচিত, যার পরিচয় আমাদের পুরোন সাহিত্যে পাওয়া যায়।

খাঁড়ি বেয়ে আমরা এবার পুরোন পথে বেরিয়ে এলাম। পথে দেখা হল দুটি জেলেনৌকার সাথে। নৌকাতেই এদের সংসার, একটিতে হাড়ি, উনুন, মিষ্টি জলের জালা, ইত্যাদি রয়েছে। মিষ্টি জলের বিনিময়ে এদের কাছ থেকে আমরা কাঁকড়া, চিংড়ি, পার্শে—কিছু মাছ নিলাম। সুন্দরবনের জলে-বাদায় কাগজের টাকার বিশেষ দাম নেই। 'বড়বালি', 'ছোটবালির'

থেকে দূরত্ব যত বাড়বে, মিষ্টি জলের মূল্য ততই বাড়বে। বড়বালি, ছোটবালি হল মিষ্টি পানীয় জল পাওয়ার জায়গা। বালির মধ্যে গর্ত খোঁড়া হল—তিরতির করে মিষ্টি জল জমে সেখানে, জেলে, মউলেরা সেখান থেকে জল কেটে নেয়। একদল জল ছেঁচে নিয়ে চলে গেলে সেই গর্তে আবার ধীরে ধীরে জল ভরে ওঠে, কেউ অনেকদিন জল না কাটলে ঝরে পড়া বালিতে গর্তটা ভরাট হয়ে যায়। এখানে জেলে-বেদে-বাউলে-মউলেরা একে অপরের সাথে নুন, লঙ্কা, মশলার বদলে মাছ, সবজির বদলে কাঁকড়া, আর মিষ্টি জলের পরিবর্তে সব কিছু বিনিময় করে। বড়বালির দূরত্ব এখান থেকে প্রায় এক-ভাঁটি পথ অর্থাৎ পাঁচ-ছয় ঘন্টা, ছোটবালি আরও দূরে—সমুদ্রসৈকতের কাছাকাছি, নেতাধোপানী পার হয়ে। জেলেরা, ভাটির সময় সুতি এবং খাঁড়ি খালের মুখে জাল ফেলে প্রচুর মাছ ধরে। নৌকার গলুই-এর মধ্যে বড় মাটির পাত্রে জল ভরে রেখে দেয়। এর মধ্যে কিছু তারা নিজেরা ব্যবহার করে এবং বাকিটা সবচেয়ে কাছের হাটেই বিক্রি করে দেয় পচে যাওয়ার ভয়ে। মউলে এবং জেলেরা তাদের কাজ হয়ে গেলে শুকনো কাঠ কেটে নিয়ে ফিরে আসে।

বিকালের রোদ পড়তে শুরু করতেই আমরা ফিরে এলাম। খুব ইচ্ছা ছিল জঙ্গলের 'কোর এরিয়াতে' এক রাত কাটানোর, যদি 'তার' দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে তার অনুমতি পাওয়া গেল না। সজনেখালি বা পাখিরালয়ের 'বাফার এরিয়াতে' সম্ভাবনা কম, তাই আমরা সুধন্যখালির জঙ্গলের সামনে যেখানে পেট্রোল বোটগুলি বাঁধা থাকে সেখানে লঞ্চে রাত কাটাব বলে ঠিক করলাম। সারেঙ জানাল এখানে ডাকাতের ভয় আছে। তারা আধুনিক লাইট মেশিনগান, হাতবোমা, স্টেনগান প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রও যোগাড় করে ফেলেছে, কাজেই বোটে উঠে ডাকাতি করাটা বেশ অনায়াসসাধ্য। সুতরাং সাবধানে থাকতে হবে। সকালে জেলেদের কাছ থেকে পাওয়া মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়াগুলোকে সারেঙ মাটির জালায় জলে দিয়ে রেখেছিল। রাতে খাবারের মেনুটা অদ্ভুত রকমের সুন্দর—গরম ভাতের সঙ্গে হেতালের মাথায় বড়া, পেঁয়াজ রসুন —লঙ্কা দিয়ে কচি কাঁকড়ার ঝাল আর কুচো চিংড়ি দিয়ে কেওড়া ফলের টক। আহার পর্ব সমাপ্ত হলে সারেঙকে ঘিরে আমরা গল্প শুরু করলাম। সারেঙ জানাল তার বাড়ির পাশের নিশি মউলের কথা চৈত্রের শুরুতে কোন এক দিনে সে ও পুজো-পাঠ সেরে, পায়রা বলি দিয়ে জঙ্গলে ঢুকেচিল। গরান ফুলের মধু খাওয়া মৌমাছিকে ধাওয়া করতে করতে তাদের পুরো দলটাই ঢুকে পড়েছিল হ্যাঁতাল পাতার নিশ্চিদ্র জঙ্গলে। নিশি ছিল দলের একেবারে পিছনে—'কখন কোথা থেকে যে বাবু বড়মিঞা এসে পড়ল, টেরই পায় নি, প্রায় চুপিসাড়ে তুলে নিয়ে চলে গেল.....হই হই করে সবাই ছুটে গেছিল, ..., মাথাটা কই মাছের মত চিবিয়ে বাদায় ফেলে রেখে গিয়েছিল।' শুনে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। সারেঙ আরো বলতে লাগল এই মরণ মাছিকে অনুসরণ করাই এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা, আমরা সকালে যে খাঁড়িটাতে ঢুকেছিলাম, সেখানেই নিশিকে বাঘে তুলেছিলো, ঝামটির সংখ্যাও প্রচুর। সকাল আমরা যদি ভয় পাই, তাই বলেননি, মানুষ, বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য নয়, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এখানকার প্রায় সব বাঘই মানুষখেকো। সারেঙ বলেছিল নোঙরটা শক্ত করে লাগাতে। এর কারণটা আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি, শীতকালে সাধারণত এই অঞ্চলে ঝড়বৃষ্টি হয় না, কিন্তু সেদিন কিছুক্ষণ পরেই প্রচণ্ড ঝড় উঠল। আমরা যারা শহরাঞ্চলে থাকি অনেকসময়ই ঝড়ের প্রকৃত গতিবেগ বুঝতে পারি না, জলের উপর উন্মুক্ত স্থানে সমুদ্র থেকে ধেয়ে আসা হাওয়া প্রবলবেগে ধাক্কা মারছিল আমাদের লঞ্চে। লঞ্চের পাশে থাকা পেট্রোল বোটগুলির সঙ্গে একটি ডিঙিটি দড়ি ছিঁড়ে আমাদের লঞ্চের গা ঘেঁসে সজোরে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে উল্টোদিকের কাদাপাড়ে গিয়ে আটকে গেল। সোজাসুজি ধাক্কা লাগলে লঞ্চ ফুটো হয়েও যেতে পারত, এই অবস্থায় কেমাত্র ওপরওয়ালাই ভরসা। নোঙর ছিঁড়ে ঝড়ের দাপটে লঞ্চ যদি বিদ্যাধরী, মাতলা কিংবা হেড়োডাঙার মুখে গিয়ে পড়ত তাহলে হয়তো আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম—এটা আমার জলের উপর রাত কাটানোর এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

পরের দিন সকালে প্রকৃতিকে আবিষ্কার করলাম অন্য এক রূপে। ঝড়ের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আমাদের চারিদিকে—সেই ডিঙিটা কাদায় মুখ থুবড়ে গেঁথে রয়েছে। ত্রিপলের কানাগুলো ফেটে গিয়েছে, গাছের ডাল ভেঙে ডেকের উপর এসে পড়েছে। খাবারের রসদ মজুদই ছিল, শুধু মাছ রাখা মাটির জালাটা ডেকের উপর দু-টুকরো হয়ে পড়ে আছে। যাই হোক, আমরা পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম নেতাধোপানীর উদ্দেশ্যে। জলের ঠিক উপরে-উপরে খুব নীচু দিয়ে উড়ে চলেছে একদল মেছো বক—বর্ষায় বনের ভয়াবহ রূপের মধ্যেই দেখা মেলে রেখা, রুচো, দাঁতনে, ভাঙন, কালভোমরা, পান-খাওয়া,

বানানিবিমুনি, ইত্যাদি নাম না-জানা মাছের। অনেকগুলি ট্যাঁক পেরিয়ে গেলাম—বনের গভীরে যে উঁচু জায়গা থাকে, তাকে ট্যাঁক বলে। জোয়ারের সময়ও ট্যাঁক শুকনো থাকে, তাই জন্তু-জানোয়ারেরা এখানে তখন আশ্রয় নেয়। একটি ট্যাকে বড় বড় কেওড়াগাছগুলোর নীচে অনেকখানি ফাঁকা জমি, সেখানে একটা হরিণের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে,কেওড়া ফল এদের প্রিয় খাদ্য। বুঝতে পারলাম এখানে ধারে কাছে বাঘ নেই। প্রায় বেলা এগারোটার সময় আমরা এসে পড়লাম ন-বাঁকির মুখে। এখন ভাঁটার সময়—লঞ্চ বেশ ধীরে চলছে। আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে প্রায় বেলা বারোটা নাগাদ খিচুড়ি আর হেতালের বড়া দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারলাম। হঠাৎ সারেঙ সতর্ক হয়ে উঠল লঞ্চের স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে, পাড় থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সারেঙ আমাদের লঞ্চটাকে এগিয়ে নিয়ে চলল খালের দিকে। চোখে পড়ল এক বিশাল বড় রয়াল বেঙ্গল টাইগার খালের কাছে পাড়ের উপর কিছু খাচ্ছে। সারেঙ জানাল ভাঁটার সময় বাঘ খালে নেমে আসে এবং সামনের থাবা মেরে এক এক ঝটকায় মাছকে পাড়ে তুলে দিতে দিতে খাল বরাবর এগিয়ে যায়—অনেকগুলো স্থানে জড়ো করে ফিরতি পথে খেতে আরম্ভ করে। প্রায় ছোটখাট একটা ঘোড়ার মত সাইজের এই বাঘটির চেহারা অসাধারণ, রোদ পড়ে শরীরটা যেন ঝকঝক করছে। সারেঙ জানাল বেশীক্ষণ এই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা বিপজ্জনক, লঞ্চ পুনরায় চলতে শুরু করল। হঠাৎ দেখা গেল বাঘটি আমাদের লঞ্চের সমান্তরাল পাড় দিয়ে হাঁটছে। আমরা এবার আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম—সারেঙ পাড় থেকে ক্রমশ দূরত্ব বাড়াতে লাগল এবং লঞ্চের গতি বাড়িয়ে দিল। তারপরেও প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট ধরে বাঘটি আমাদের লঞ্চের পিছনে পিছনে এসেছিল। সারেঙ্গ জানাল এখানকার বাঘেদের এই অদ্ভুত স্বভাবের কথা—মাছ খাওয়ার কথা, হয়তো কাল রাতের ঝড়ে শিকার ধরা হয়নি। তাই তার আজকের মাছ শিকার। তারপর আমরা যখন নেতিধোপানীতে পৌঁছে আমাদের অবিজ্ঞতার কথা জানালাম, তখন তারা তা বিশ্বাসই করতে চাইছিল না। অবশেষে সারেঙ এসেঘটনার সত্যতা স্বীকার করতে ওখানার লোকজন আমাদের কথা বিশ্বাস করল। তারা জানাল এই বাঘটি এখানকার অন্যতম মানুষখেকো, বেশ কয়েকজনকে তুলে নিয়ে গেছে, বেশ কয়েকবার সরকারী লঞ্চকে ধাওয়া করেছে। এর গতিবিধি খুবই ভয়ঙ্কর এবং সরকারী বিশেষজ্ঞদেরও অনুমান অসাধ্য। বিকালে নারকেলের শাঁস, মুড়ি আর বিশেষ ধরণের হালকা হলুদ রঙ-এর খেঁজুর দিয়ে জলখাবার সারলাম। বেশ খানিকটা গল্পগুজবের পর তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম, সবাই খুব ক্লান্ত, পরের দিন আমার শুরু করতে হবে।

পরের দিন আমাদের যাত্রা শুরু হল চামটার উদ্দেশ্যে। চামটা-ব্লকটি এখানকার সবচেয়ে ঘন অরণ্য—কোর এরিয়া হিসাবে পরিচিত। সারেঙ আমাদের গাছ চেনাতে শুরু করল। লাল লতা ধরনের পাতা গেঁওয়ার, এর কাঠ দিয়ে আবার তবলা, ঢোলকের খোল তৈরী হয়, বেশ বড় আকারের গোল ধরনের পাতা—গোলপাতা গাছ, এর পাতায় ঘরের ছাউনি তৈরী হয়, সুন্দরীর কাঠ গাঢ় লাল রঙের—লোনা জলের নৌকা বানাতে খুবই উপযোগী। এখানকার অধিকাংশ গাছই খুব লম্বা, যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে সূর্যের আলোর কাছে পৌঁছানোর জন্য, গোড়ার কাছে লতা গুল্মের একেবারে নেই বললেই চলে। এর মধ্যে কোন কোন স্থানে ছোট-ছোট নিবীড় বন চোখে পড়ল—সারেঙ জানাল এগুলি টক-সুঁদরি বন। এই অঞ্চলে বাঘের সংখ্যা এবং সম্ভাবনা সর্বাধিক। এই টক-সুঁদরি বনের মধ্যে দিয়ে বাঘ হরিণকে তাড়া করে নিয়ে যায় যাতে নিবীড় বনে হরিণের সিঙ আটকে যায়—এই সবই আমাদের সারেমের মুখ থেকে শোনা। বনমাটির সংখ্যাও এখানে প্রচুর। গতকাল 'ব্যাঘ্রদর্শন হয়ে গেছে। বলেই আজ আর হয়তো আমাদের মধ্যে সেই উৎসাহটা ছিল না, তবে প্রকৃত কারণটা হয়তো অন্য। গত কয়েকদিনের সুন্দরবনের অভিজ্ঞতা, বিশেষত গতকাল বাঘের লঞ্চের পিছু ধাওয়া করার ঘটনায় আমরা বেশ হতবাক এবং শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। আগেই বলেছি এই অঞ্চলে ঝামটির সংখযা প্রচুর—কোন কোন গাছের ডালে একইসঙ্গে চার-পাঁচটি করেও ঝামটি ঝুলছে। অবশেষে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে এলাম। ফিরতে হবে কৃষিখামারে, প্রায় ঘন্টা চারেকের রাস্তা। এখন জোয়ার আর ভাঁটার মাঝামাঝি সময়—আমরা এগিয়ে চললাম ফেরার রাস্তায়, ঘন জঙ্গল ক্রমশ হাল্কা হয়ে আসতে লাগল। তীর সংলগ্ন জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় চোখে পড়ল পুরোন বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। সারেঙ জানাল গোটা সুন্দরবন অঞ্চলে এই ধরণের ঘর বাড়ির অস্তিত্ব দেখা যায়। বহুদিন আগে এখানে নগর সভ্যতা ছিল, পর্তুগীজ দস্যুরাও এই অঞ্চলে তাদের আশ্রয়স্থল বানিয়েছিল, পরে সেগুলি আবার দুষ্কৃতীদের আড্ডাখানায় কিংবা নুনের কারখানায় পরিণত হয়—এগুলি তাদেরই ধ্বংসাবশেষ। সারেঙ হঠাৎ জলের উপর ঝুঁকে পড়া একটা ডাল

থেকে কিছু খয়েরী রঙের গোলফলের কাঁদি ছিঁড়ে নিয়ে আমাদের খেতে দিল— তালশাঁসের মত মিষ্টি মিষ্টি খেতে। বন্য পরিবেশে বন্য খাদ্য আমাদের সভ্য জগতের মানুষজনেদের কাছে অবশ্যই একটা বিশেষ প্রাপ্তি। পথে চোখে পড়ল গোলপাতা ভরা নৌকা—এগুলিতে শুধু ছোট একটা ছাউনি থেকে, বাকিটা পাতার ভরা। বেলা যত বাড়তে লাগল, গরমও ততই বাড়তে লাগল, শীতকালে একটা গরম আমরা কিন্তু আশা করিনি। সারেঙকে সে কথা জানাতেই তিনি আমাদের জানালেন বিশ্ব উষ্ণায়নের কারনেই এখানকার প্রকৃতির এই পরিবর্তন, গত পরশুর ঝড়বৃষ্টির কারণও হয়তো তাই। একবিংশ শতাব্দীর শেষে হয়তো সমুদ্রপৃষ্ঠ প্রায় ৪৫সেমি উঠে আসবে যার ফলে সুন্দরবনের বড় একটা অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, বর্তমানে লোহাচর, নিউমূর, দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ তলিয়ে গেছে, ঘোরামারা দ্বীপ অর্ধেক ডুবে গেছে। এখন সেই কথাগুলির সারমর্ম বুঝতে পারি—কয়েকদিন আগের আয়লার কারণও তো তাই। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বলয় নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকাকে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করে। অবশেষে প্রায় বিকাল তিনটের সময় কৃষি খামারে এসে পৌঁছলাম, দুপুরে খাবারের আয়োজনটা অসাধারণ ছিল—গরম ভাতের উপর ঘি দিয়ে খয়রা মাছ ভাজা, ভেটকির কাঁটা-চচ্চড়ি, ট্যংরা মাছের ঝাল। বাকি দিনটা খামারে কাটিয়ে পরের দিন সকালে রওনা হলাম ক্যানিং এর উদ্দেশ্যে—বাড়ির পথে।

সুন্দরবনকে শুধুমাত্র ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ দিয়ে ব্যাখ্যা করলে যথাযথ হয় না, তার সাথে যথাযথ পরিচয় করতে হলে প্রয়োজন এখানকার মানুষজনকে চেনা-জানা। গরীব চাষী-জেলে-মউলে-বাউলেরা নিজের চরম দারিদ্র্যের সাথে সাথে বাঘ-কুমীর, ঝড়-ঝঞ্ঝা, খাদ্য-পানীয়ের অভাবের সঙ্গে সড়াই করে, লোনা জলের সঙ্গে সখ্যতা করে বেঁচে থাকে। কিন্তু তাদের লড়াকু মানসিকতা, একে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, দুর্জয় সাহসের বিন্দুমাত্র ঘাটতি হয় না। বিভিন্ন লোকাচার, আঞ্চলিক দেবদেবীর আরাধনা এখানকার সমাজজীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য-বনবিবি এদের প্রধান আরাধ্য দেবতা, ইতিহাসে বনবিবির পরিচয় সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায় না। খাস সুন্দরবন এলাকায় বনবিবিকে স্মরণ না করে কেউ জঙ্গলে ঢোকে না, বনবিবিকে এরা যেমন শ্রদ্ধা করে তেমন ভয়ও পায়। তার পুজোয় কোন ফুল, কোন মন্ত্র, কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস বনবিবি তুষ্ট থাকলে বাঘে মানুষ নেয় না। সুন্দরবনের পশ্চিম অঞ্চলে, আশ-পাশের জেলার কোন কোন অঞ্চলে যোদ্ধা দক্ষিণা-রায় পূজা পান। স্থানীয় লোককথা অনুযায়ী পাঠান আমলের 'ব্যাঘ্রদেবতা' হিসাবে পরিচিত দক্ষিণা রায়ের সঙ্গে পরবর্তীকালে বনবিবির এই আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে একাধিকবার যুদ্ধ বাঁধে, সেই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বনবিবি বিজয়ী হন এবং অধিকাংশ জঙ্গল অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জঙ্গলের নিকটবর্তী অঞ্চলের গ্রামে প্রায়ই বাঘের উপদ্রব দেখা যায়। জঙ্গলে খাদ্যাভাব ঘটলে বা অনেক সময় বিনা কারণেই বাঘ নিকটবর্তী গ্রামে হানা দেয়, বনবিভাগ সঠিক সময়ে খবর পেলে সেই বাঘকে খাঁচাবন্দি করে পুনরায় জঙ্গলে ছেড়ে দেয়।

কয়েক বছর আগে আয়লায় বিধ্বস্ত হওয়ার পরে বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলিকে পুনরায় গঠনের চেষ্টা চলছে, নয়াচরে সমুদ্রবন্দর গঠনের প্রস্তাব উঠেছে। ভবিষ্যতে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষিণবঙ্গের এই বিশেষ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। নয়াচরের সঙ্গে জলপথে এই অঞ্চলকে যুক্ত করে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারলে রপ্তানি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব, সুন্দরবন অঞ্চলের প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি মধু, মোম, মাছ এবং সর্বোপরি পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারলে সুন্দরবন অঞ্চল যথাযথভাবে প্রচারের আলো পাবে এবং বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করবে।

তরঙ্গ

A Rose is Passing over out The Fence

Kalobaran Parai
D.I.G.(R), Range-VII

I am strolling with a rose in my pocket
not the beauties only, the smell of tuberrose,
jesmin, berry beat me in heart.
The gardens of terraced roof lean hanging
over the road.
White walls stand linen parallel, calm and cool.

If there is any buzz, there is men
I feel disturbed in getting essence.
Alone teary eyes. I'll give you a sea
Where ships are swinging in the waves of blue
Where controlled nudist-beach opens
the sand-doors gold.

How much colour blind you are, guys!
Look for a little while, colours of the world all
am I dispering today widely enough with
Victory-march
Woe-begone cloudy face along the hanging roof
let's come forward once anew.
It's just not much late
I'm strolling with a rose in my pocket.

A man plants a tree. A tree grows a rose
I originate myself from a rose to a rose,
Today is the day when lights should be lit up
all around.
River dilutes water to precepitate the mud.
To have a free-lance-move I've a December to cool.
Today is the day where seeds of all
the vegetables, fruits and flowers
are borne in the air,
The demons of anger are conquered through
glares.

Overgrown interior overgrows paddy.
Spice of life is spice of nice.
A morning red rose is passing over
out the fence
Pick it up right now if you can.

যদিও আমার চোখের আড়ালে

সত্যজিৎ বিশ্বাস

এ. ডি. এস. আর., দুর্গাপুর

যদিও আমার চোখের আড়ালে,
কোন দিগন্তে সরিয়া দাঁড়ালে,
ভয় নাহি কিছু মানি ।
আসিবে স্বপনে তুমি।।

খুলিয়া রাখিনু মম হৃদয়ের দ্বার;
নিশিত ক্ষণে হেথা তব অভিসার,
হেথা তব আগমনী।
আসিবে স্বপনে তুমি।।

আমি মিছে রাখি মনে ভয়,
আমি মিছে মানি সংশয়,
হৃদয়ে আড়াল তানি।
আসিবে স্বপনে তুমি।।

মাধবী রাতি তোছনায় তলমল্,
নীচে তটিনী বহে যায় কলকল্,
সেথা পাশে তুমি রানী।
আসিবে স্বপনে তুমি।।

বেলা ডুবে যায়, ফুটিবে রজনীগন্ধা,
গন্ধে তাহার ভরিবে নীরব সন্ধ্যা,
সেথা তব গান শুনি।
স্বপনে আসিবে তুমি।।

পদ্য-পাতা

বিশ্বরূপ গোস্বামী

এ. ডি. এস. আর., সালার

ফেরা

অনেকবারই, অনেক অনেক বার চলে গিয়েও
আবার ফিরে এসেছ—যেভাবে সবকিছু চলে গিয়ে,
অনেক কিছু হয়ে আবার ফেরে, দিনের পরে দিনের
চলে যাওয়ার পর—রাত্রি এবং রাত্রির পরে
আবার দিন যেমন করে ক্ষিদে নিয়ে ফেরে।

জীবন যেমন ক্রমে লিখে লিখে যাওয়া
মৃত্যুর গল্প, তবু কাল পরশুকে অতীত করে
আবার আজ জীবন সাজে, যেমন করে কাগজ ফুলে
রঙ আসে, মেঘ শেষে বৃষ্টি হয়ে নাচে, আর
চাঁদও ক্রমশঃ ক্ষয়ে ক্ষয়ে পূর্ণিমাতে বাঁচে, তেমনি ফেরা।

রূপকথার মতো বাঁচে কিছু স্মৃতি, প্রায়
সকলেরই, সাজিয়ে রাখা রাখি সেই সব
ভেসে বেড়ানো, প্ল্যাটফর্ম ঘেঁষে দাঁড়ানো
লোকাল ট্রেনের জানলায় কয়েক মুহূর্ত তোমাকে
দেখা, ফিরে আসতেও পারে, গোধুলির ক্যানভাসে।

যতবারই চলে যাওয়া, ততবারই সত্যি হয়
যেন ফিরে আসা, তোমার ফিরে আসা'র
ইচ্ছেরা ঘুমিয়ে থাকে, কারন সব শস্যই সময়ে
বীজে ফিরে আসে, যেভাবে সব চলে যাওয়া
ফিরে আসে, তপোবনে দুষ্মন্ত ফেরে।

সপ্তপদী

তুমিই বলো
না না তুমি
তুমি
তুমি
আরে আমি নয়, আমি বলব না এখন
তুমি বলো।
আমি বলব? ঠিক আছে বলছি
তবে কী বলি বলো?
আকাশ বলব
বলব ঘূর্ণি হাওয়া ঝড়
বলব তুমি পাগলী
না হয় পথ হারানো নদী

তুমি সুগন্ধ
তুমি মুঠো ফুল
বলছি তুমি অনন্ত
বলেই রাখছি মিশে যাই, তুমি বসন্ত

তুমি সুর
কল্যান ঠাটে বাঁধা
একা একাকীতে মালকোষ রাগ হও
আমি নিজস্ব গান লিখি
তুমি সুরে সুরে হেঁটে যাও

তুমি উড়ন্ত
উড়ছে তোমার উড়ন্ত পথ ঘাট
গাইছো গাইছো
'মন আমার মিশে গেলে বেশ হয়।'

এস. এম. এস.

কতো হরপ্পা বর্ষ কেটে গেল
চড়ুই এর মত খুঁজি
সময়, এখনো,
তুমি সময় পেলে লিখো।

কথা

জেগে জেগে কী করছ
কথা ভাসানিয়া খেলা?
জানো সেটা কেমন?
কানে কানে বলব।

A True Friend

Amit Bandyopadhyay
A.D.S.R., Habra

From the benign begining
Till the end
Stays with you in the sky afloat
Down with you even in great depth.
Binds with you here and there,
Encompasses you in every sphere,
Bustles with you in joy,
Even in sorrow stays with you avow,
Closest to heart stronger than any bond,
More precious to diamond,
The greatest gift god has bestowed.
With your eyes even in blind fold,
You can sense this from impeccable blend,
It's all about a true friend.

চেনা-অচেনা

আমার দেখা পাঁচ নায়িকা

পূর্ণচন্দ্র হালদার (ওরফে পূর্ণেন্দু হালদার)

ডি. আই. তি(আর), রেঞ্জ-তিন

সালতা ইং ১৯৯৪। আমার কাহিনী ও চিত্রনাত্যে বাংলা সিনেমা 'জীবন সন্ধান' শুরু হলো রমাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায়। মুখ্য চরিত্রে আমি (হরিদাস) এবং রাত্তেশ্বরী রায়চৌধুরী (দয়াময়ী)। অপর দুই প্রধান চরিত্রে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী (তরুন) এবং রচনা ব্যানার্জী (বিনু)। সহশিল্পী হিসেবে পেলাম বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় (গিরিধারী), অনুপকুমার (শঙ্কর), নির্মলকুমার, শকুন্তলা বরুয়া প্রমুখকে।

রাত্তেশ্বরীর এতাই শেষ ছবি। কবিতা সিংহের মেয়ে রাত্তেশ্বরী তখন চলচ্চিত্র জাতে প্রতিষ্ঠিত আর আমি মাত্র কিছুদিন হলো নান্দীকার ও আমার নিত্তের তৈরী নাত্যদল 'ক্যালকাতা থিয়েতার এ্যাকাডেমী' ও 'এ. তি এস' ছেড়ে তিন চারতে ছবিতে ছোত চরিত্রে মুখ দেখিয়েছি মাত্র। সেদিক দিয়ে চলচ্চিত্রে আমি প্রায় নবাগত। রাত্তহংসকূলে এক অর্বাচীন বকের মতো প্রবেশ করে রাত্তেশ্বরীর বিপরীতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছি এবং তা-ও আবার ৩৫ মিঃ মিঃ রঙিন বাংলা ছবিতে। অবশ্য নত-নির্দেশক অভিনেতা হিসেবে ইতমধ্যেই আমার স্বল্প পরিচিতি হয়েছে যা এক্ষেত্রে খানিকতা কাত করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপার হরফে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গেছে আমার কয়েকতা নাতক ও কবিতা। প্রকাশ পেয়েছে আমার লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রস্তুতি পর্বের কবিতা। তবু তেকনিসিয়ান স্তুডিও তে এ ছবির মহরতের দিনে একতা বাড়তি শিহরন ছিলই। কিন্তু রাত্তেশ্বরীর স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও সারল্য সেদিন আমার কাছে হয়ে উঠল ঈশ্বরের দান।

'জীবন-সন্ধান' ছবির শুটিং-এর কারণে টেকনিসিয়ান-১ ও ২, এন.টি.ওয়ান, ইন্দ্রপুরী এবং কলকাতা ও বাইরের বিভিন্ন লোকেশনে আমাকে যেতে হয়েছে। সর্বত্রই রাজেশ্বরীকে দেখেছি বাঙালী ঘরের অতি চেনা আটপৌরে পাশের বাড়ীর মেয়ের মতো। কি অসাধারণ অভিনয় করেছিল রাজেশ্বরী এ ছবিতে। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে ওর ডেড্‌বডির সামনে আমি সত্যি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম, মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যিই আমার কোনও প্রিয়জন যেন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল, আনন্দ মুখার্জী ও অন্যান্য পুলিশরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে সাত্তিক, বাচিক, আঙ্গিক, আহার্য্য অভিনয়ের এই চার রীতি রাজেশ্বরীর ভাবানুষঙ্গের মধ্যে দিয়ে আমার দেহ মনে যেন একাকার হয়ে গেল।

মনে পড়ছে—কলকাতার টালিগঞ্জে গল্‌ফ ক্লাব রোডে অবস্থিত 'ফিল্ম সার্ভিস' স্টুডিওর কথা। এই স্টুডিওর কর্মকর্তা ছিলেন অতীত দিনের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক অজয় করের ভাইপো অজিত কর। ওখানকার তিনতলার ওপরে একটা ঘরে থাকতেন চিত্রসম্পাদক (এডিটর) রমেশ যোশী রমেশদা এ-ছবিরও এডিটর ছিলেন, একতলায় প্রজেকশন রুম ছিল যেখানে ছবি তৈরীর পর বড় পর্দায় দেখার ব্যবস্থা চিল। এখন এই স্টুডিওতে ডাবিং, স্কোরিং ও এফ সি পি এডিটিং এর ব্যবস্থা হয়েছে। তখন এসব ছিল না। দোতলায় ছিল নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্করের নাচের স্কুল। ওই দোতলাতেই 'জীবন সন্ধান' এর শুটিং চলছিল। সেটে আমার সঙ্গে ছিল রাজেশ্বরী ও নির্মলকুমার। সেদিন রাজেশ্বরী বলেছিল—'পূর্ণেন্দু, তোমার লেখা এই চিত্রনাট্যে যেরকম খেটে আমি অভিনয় করছি সেরকম বোধ হয় আর কোনও ছবিতে অভিনয় করি নি।' রাজেশ্বরীর মুখে এ কথাটা শুনে ভাল লেগেছিল। হায় রে! সেদিন তো ঘূনাক্ষরেও বুঝতে পারিনি যে এর পরদিনই আমায় শুনতে হবে সেই মর্মান্তিক খারাপ খবরটা 'রাজেশ্বরী আর নেই'। হ্যাঁ ওই দিনই শুটিং সেরে বাড়ীতে ফিরে হেপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী।

পরের দিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল রাজেশ্বরীর মৃত্যু সংবাদ। সঙ্গে 'জীবনসন্ধান' ছবিতে রাজেশ্বরী ও আমার জোট অভিনয়ের ছবি। 'The Asian Age' লিখল—'Last tribute to Rajeswari'. সেখানেও আমার ও রাজেশ্বরীর ছবি। যে ছবির নাম 'জীবন-সন্ধান' সেই ছবিরই এক নায়িকার সত্যিকারের জীবনান্তে তার মরণের সঙ্গে ফটো হয়ে জুড়ে থাকল আমার নাম, একেই বলে বোধ হয় বিধাতার খেলা।

ছবিটা রাজেশ্বরী শেষ করে যেতে পারেনি। অনেক কষ্ট ও কেরামতি করে ছবিটা শেষ হল এবং রাজেশ্বরীর